নীরা আর্য : নেতাজির গুপ্তচর

প্রব্রাজিকা বীতভয়প্রাণা
শ্রীসারদা মঠ

ভারতমাতার বীর সন্তানেরা যুগ যুগ ধরে জন্মভূমির সেবায় কখনও শাসকরূপে, কখনও যোদ্ধারূপে যুদ্ধভূমিতে নিজেদের উৎসর্গ করে রেখে গেছেন রক্ত-রাঙা ইতিহাস। তাঁদের মধ্যে রণভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন এমন সব সাহসিনী যাঁরা শত্রুপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে প্রমাণ করেছিলেন ভারতভূমি কেবল অবলা অবগুণ্ঠিতাদের নয়, বরং কালী-দুর্গাদেরই বিচরণভূমি। এমনই এক অগ্নিকন্যা নীরা আর্য। যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে, ততদিন কেবল ভারতবাসী নয়, বিশ্বের প্রতিটি দেশভক্তের দেশপ্রেমের অনির্বাণ দীপশিখা হয়ে থাকবেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। কিন্তু খুব কম মানুষই জানেন, নীরা আর্য না থাকলে ভারতবর্ষ নেতাজীকে অনেক আগেই হারাত। নিজের গুপ্তচর স্বামীকে হত্যা করেছিলেন এই নারী, নেতাজীর জীবন রক্ষা করতে। ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়ার পর নেতাজী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নীরার উপর চালানো হয়েছিল অমানুষিক অত্যাচার। এমনকী সাঁড়াশি দিয়ে তাঁর ডান স্তনটি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, তবু তিনি মুখ খোলেননি।

স্বাধীন ভারতে তাঁর জীবন অনাহারে অনাদরে কাটলেও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত নীরা দৃপ্ততার সঙ্গে সরকারপ্রদত্ত মুক্তিযোদ্ধার ভাতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। স্বাধীন ভারতভূমির বুকে দাঁড়িয়ে আমরা ভুলে গেছি সেসব দিনের কথা। ।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহাবীর সিং ও তাঁর পত্নী লক্ষ্মী দেবীর কন্যা নীরার জন্ম ১৯০২ সালের ৫ মার্চ, উত্তরপ্রদেশের মিরাট ও দিল্লির সীমান্তবর্তী খেকড়া গ্রামে। মাত্র আট বছর বয়সে এক মহামারিতে নীরা পিতামাতা দুজনকেই হারান। তাঁর এই দুঃসময়ের পূর্ণ সুযোগ নেন স্থানীয় মহাজন ঠক্কনলাল। বাস্তুচ্যুত হয়ে নীরা ছোট ভাই বসন্তকে নিয়ে অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটাতেন। নিজের গ্রামে আর্যসমাজের সামনে বসে ফুল বিক্রি করতেন নীরা। একদিন আর্যসমাজের এক সমাবেশে খেকড়ায় আসেন কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শেঠ চৌধুরী ছাজ্জুরাম লাম্বা। আর্যসমাজের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে নীরা ও বসন্ত সম্পর্কে জানতে পেরে ছাজ্জুরামজী তাঁদের দুজনকে দত্তক নেন।

ছাজ্জুরামজীর সঙ্গে নীরা ও বসন্ত কলকাতায় চলে আসেন। ছাজ্জুরামজী কলকাতার নিকটস্থ ভগবানপুরে বনী ঘোষের আবাসিক বিদ্যালয়ে তাঁদের ভর্তি করে দেন। বনী ঘোষ ও তাঁর স্নেহময়ী পত্নী এই দুই অনাথ শিশুকে সন্তান স্নেহে লালনপালন ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু বনী ঘোষের অকালমৃত্যু হলে ছাজ্জুরামজী এই দুই শিশুকে স্বগৃহে নিয়ে আসেন ও তাঁদের শিক্ষার দায়িত্ব নেন। তিনি শুধু ব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন আর্যসমাজের কট্টর অনুগামী ও মনেপ্রাণে দেশপ্রেমী। বিশিষ্ট স্বাধীনতা কর্মীরা তাঁর বাসভবনে আসতেন। একবার পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে স্বয়ং ভগৎ সিং ছাজ্জুরামের গৃহে আশ্রয় নেন। যে-বাড়ির বাতাসে বিপ্লবের গন্ধ সেই বাড়ির মেয়ে কি সাধারণ হতে পারে? বড় বড় বিপ্লবীদের কথা, দেশপ্রেম নীরাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পালক পিতার প্রভাবেই নীরা প্রত্যক্ষভাবে আর্যসমাজের সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর থেকে 'নীরা সিং' 'নীরা আর্য' নামে পরিচিত হন। মেধাবিনী নীরা হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা তিনটি ভাষাতেই সাবলীল ছিলেন।

একদিন বন্ধুদের সঙ্গে নীরা সমুদ্রের ধারে পিকনিক করতে যান। দূর থেকে সমুদ্র যতটা সুন্দর, কাছ থেকে ততটাই ভয়ংকর—নীরা সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পান। তিনি সাঁতার জানতেন কিন্তু পুকুরে সাঁতার কাটা আর সমুদ্রে সাঁতার কাটা তো এক নয়! হঠাৎই এক বিশাল ঢেউ তাঁকে গভীর সমুদ্রে টেনে নিয়ে যায়। নীরা সমুদ্রে তলিয়ে যেতে থাকেন। পাড়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুরা চিৎকার করলেও কেউ সাহস করে সমুদ্রে নামতে পারছিল না। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল সব শেষ, তখন এগিয়ে এলেন এক যুবক। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে নীরাকে তিনি পাড়ে তুলে নিয়ে এলেন। তিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সকৃতজ্ঞ নীরা যুবককে বললেন, "দাদা, আপনার এই উপকার আমি মৃত্যু পর্যন্ত মনে রাখব। আপনার এই ঋণ একদিন না একদিন আমি পরিশোধ করব।" দিনটি ছিল পবিত্র রাখিপূর্ণিমা। ভ্রাতৃবরণের জন্য সেদিন নীরার কাছে একখানা সুতোও ছিল না। অনন্যোপায় নীরা নিজের মাথা থেকে কিছু কেশ ছিঁড়ে সুভাষচন্দ্রের হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন। নীরা তখনও জানতেন না এই একটি মুহূর্ত, এই ভাইবোনের সম্পর্ক তাঁকে নতুন পথে নিয়ে যাবে;

ক্লাসের 'ফার্স্ট গার্ল' থেকে তিনি হয়ে উঠবেন ভারতমাতার চরণপ্রান্তে বলিপ্রদত্ত কন্যা।

বৈশাখ মাসে বাংলার মানুষ নববর্ষ পালন করে। ওই শুভদিনে ব্যবসায়ের শুভারম্ভ, মন্দিরে পূজা দেওয়া, আত্মীয়স্বজনদের মিষ্টান্ন বণ্টন করা ইত্যাদি প্রচলিত রীতি। এমনই এক শুভদিনে নীরা ধর্মপিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু গুরুদাসের বাড়িতে যান। সেখানে গুরুদাসের একমাত্র সন্তান জয়রঞ্জনের সঙ্গে নীরার দেখা হয়। এরপর যখন নীরা সেখানে যেতেন জয়রঞ্জনের সঙ্গে তাঁর দেশ, ধর্ম, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হত। নীরা ও জয়রঞ্জনের এই সম্পর্ক বন্ধুত্বের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু উভয় পরিবারের ইচ্ছানুযায়ী ১৯২৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। পরে বিভিন্ন দলিলপত্র থেকে নীরা জেনেছিলেন, জয়রঞ্জনের আর-একটি নাম শ্রীকান্ত। জিজ্ঞাসা করায় নীরা জানতে পারেন ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক হিসাবে জয়রঞ্জন বিভিন্ন নামে পরিচিত। শ্রীকান্ত কেবলমাত্র ব্রিটিশদের চাকুরেই নয়, মনে প্রাণে ব্রিটিশদের গোলাম। ভারতীয় বিপ্লবীরা তার চক্ষুশূল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গ্রেফতার করা, জেল খাটানো, তাদের উপর অত্যাচার—এই ছিল শ্রীকান্তের কাজ। একদিকে নীরা, যিনি আর্যসমাজের আদর্শে বড় হয়েছেন, যাঁর রক্তে দেশপ্রেম টগবগ করে ফুটছে, আর অন্যদিকে তাঁর স্বামী, যে দেশের শত্রুদের হয়ে কাজ করছে। একই ছাদের নিচে সম্পূর্ণ দুই মেরুর মানুষ।

নীরা আর্য

নীরা যেমন ছিলেন বুদ্ধিমতী, তেমন তেজস্বিনী। একদিন নীরা জানতে পারেন একটি ভয়াবহ তথ্য—শ্রীকান্তের প্রধান উদ্দেশ্য নেতাজীকে হত্যা করা। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছে নেতাজীকে হত্যা করলে দুলাখ টাকা পুরস্কার। নীরা স্বামীকে বোঝালেন। কিন্তু শ্রীকান্তের কাছে দেশপ্রেম নয়—অর্থ, সম্মানই সব। নীরা তাকে শেষ কথা শোনালেন—চাকরি বা পত্নীর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে শ্রীকান্তকে। জয়রঞ্জনের উত্তর: স্ত্রীকে হারালে বিবাহের জন্য আরও অনেক মেয়ে পাওয়া যাবে, কিন্তু চাকরি গেলে আর চাকরি পাওয়া যাবে না। তাছাড়া পুরস্কারের অঙ্ক তো কম নয়, দুলাখ টাকায় ভবিষ্যতে সাত পুরুষ পর্যন্ত অন্ন সংস্থানের কোনও চিন্তাই থাকবে না।

স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নীরা নিজের ধর্মপিতার কাছে ফিরে আসেন। যেহেতু এক ধনী পরিবার নীরাকে দত্তক নিয়েছিল তাই গ্রামবাসীরা তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করত। কিন্তু নীরা বুঝতে পারতেন গ্রামবাসীদের আত্মীয়তা উপরে উপরে। বিবাহিতা নারীর স্বামীকে ছেড়ে

আসা অনুচিত বলে গ্রামের প্রবীণ মহিলারা তাঁকে বোঝাতেন। নারী শ্বশুরালয়ে যাওয়ার পর তার মৃতদেহই সেখান থেকে বের হত, তার আগে পিতৃগৃহে ফিরে যাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল না। কিছুদিন কলকাতায় থাকার পর নীরা দিল্লির শাহাদারায় আচার্য চতুর সেনের কাছে চলে আসেন। আর্যসমাজের ভাবধারায় মানুষ হওয়ায় নীরার পক্ষে কারও বোঝা হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। সেখানে মেয়েদের সংস্কৃত ও ইংরেজি পড়িয়ে নীরা নিজের জীবিকার বন্দোবস্ত করেন।

কিন্তু মনে তাঁর একটাই চিন্তা—দেশকে বাঁচাতে হবে। এই দিল্লির মাটি থেকেই শুরু হল নীরার স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়ে ওঠার যাত্রা। সেখানে থাকার সময় নীরা খবর পান রাম সিং নামক এক যুবক সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়ার জন্য সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন। এই তো সুযোগ। রাম সিং-এর সঙ্গে দেখা করে নীরা তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা জানান। প্রথমে রাজি না হলেও নীরার আগ্রহাতিশয্যে রাম সিং নীরা ও বসন্তকে সিঙ্গাপুর নিয়ে যেতে বাধ্য হন। রেল, বাস, গরুর গাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন যান সহযোগে প্রথমে তাঁরা মণিপুর পৌঁছন। সেখান থেকে মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া হয়ে সিঙ্গাপুর। আজাদ হিন্দ ফৌজের 'ঝান্সি রানি' রেজিমেন্টে নীরা যোগ দেন। তখন এই রেজিমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত ক্যাপটেন ডঃ লক্ষ্মী সায়গল। শুরু হয় কঠোর প্রশিক্ষণ—বন্দুক চালানো, গ্রেনেড ছোঁড়া, আশ্রয়হীন ও খাদ্যহীন অরণ্যবাস। কিন্তু নেতাজী তো জহুরি। তিনি জহর চিনতে ভুল করেন না। তিনি দেখলেন, এই মেয়েটির সাহস ও বুদ্ধি সাধারণ সৈনিকের থেকে অনেক বেশি। তাই তিনি নীরাকে পাঠালেন Intelligence Wing বা গোয়েন্দা বিভাগে। পবিত্রমোহন রাই-এর তত্ত্বাবধানে শুরু হল নীরার প্রশিক্ষণ।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ ছিল খুব শক্তিশালী, অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল তাদের পথ। সবসময় তাঁদেরকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হত। গোয়েন্দা বিভাগের মহিলারা চুল কেটে লুঙ্গি পরে মালি বা রাঁধুনি সেজে ব্রিটিশ অফিসারদের বাড়ি ও সেনাশিবিরে ঢুকে পড়তেন। কান পেতে শুনতেন তাদের গোপন পরিকল্পনা; গোপন নিশানার মাধ্যমে সেসব পৌঁছে দিতেন নেতাজীর কাছে। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র তাঁদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হত। তবে গোয়েন্দাদের প্রতি নেতাজীর নির্দেশ ছিল, ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং ব্রিটিশ সেনার হাতে ধরা পড়ার আগে পিস্তলে নিজেকে শেষ করে দিতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষ করেই নীরা হয়ে ওঠেন প্রথম মহিলা গুপ্তচর। এই দায়িত্ব ও সম্মান স্বয়ং নেতাজী তাঁকে প্রদান করেছিলেন।

নীরার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছিল যেগুলি তাঁর অপরিসীম সাহস ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তার মধ্যে একটি ঘটনা দুর্গামল গোর্খাকে নিয়ে। দুর্গামল ছিলেন নীরার ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা। একবার সামান্য ভুলের জন্য তিনি ধরা পড়ে যান। আত্মহত্যা করার সুযোগ দুর্গামল পাননি। তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়। খবর আসে শীঘ্রই তাঁকে হত্যা করা হবে। কিন্তু নীরা আর তাঁর বান্ধবী সরস্বতী রাজামণি ব্রিটিশ শিবিরে দুঃসাহসিক অভিযান করেন। বৃহন্নলা নর্তকী সেজে নাচগান দ্বারা ব্রিটিশ অফিসারদের মুগ্ধ করে তাঁরা তাদের সুরার গ্লাসে আফিম মিশিয়ে দেন। অফিসাররা মাতাল হলে দুর্গামলকে

নিয়ে তাঁরা শিবির থেকে বেরিয়ে আসেন। একজন সৈনিক তাঁদের দেখে ফেলে ও গুলি করে। এই গুলি সরস্বতী রাজামণির পায়ে লাগে। তাঁকে নিয়ে নীরা ও দুর্গামল গভীর জঙ্গলে একটি বিরাট উঁচু গাছের মগডালে লুকিয়ে পড়েন। ব্রিটিশ সেনা তন্ন তন্ন করে পুলিশ কুকুরের সাহায্যে তাঁদেরকে খুঁজতে থাকে। খাবার নেই, জল নেই, তিনদিন এইভাবে থেকে তাঁরা ফিরেছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর গোপন ডেরায়। এই দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য নেতাজী তাঁদেরকে পুরস্কৃত করেন। সরস্বতী হন ঝান্সি বাহিনীর লেফটেন্যান্ট ও নীরা ক্যাপ্টেন। মুগ্ধ নেতাজী নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব নীরার হাতে তুলে দেন।

নেতাজীর দেহরক্ষীর দায়িত্ব পালনের সময় নীরার জীবনে আসে এক কঠিন পরীক্ষার রাত। নীরা গুপ্তচরের মাধ্যমে খবর পেয়েছিলেন যে জয়রঞ্জন নেতাজীকে হত্যা করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেজন্য নীরা সবসময় উদ্বিগ্ন ও সতর্ক থাকতেন। নেতাজী সৈনিকদের মধ্যে থাকতে পছন্দ করতেন। তিনিই প্রথম যিনি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েও সামনে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। ঘটনার দিন অনেক রাত পর্যন্ত নেতাজী সেনাপতিদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শেষ করে তাঁর তাঁবুতে বিশ্রাম নিতে যান। সেই রাতে তাঁবুর ওপর নজরদারির ভার রানি লক্ষ্মীবাঈ রেজিমেন্টের উপরে ছিল। তখন রাত প্রায় দুটো। সৈনিকরা সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু অতন্দ্র পাহারায় নীরা কর্তব্যরত। শিবিরে গভীর অন্ধকারে হঠাৎ জয়রঞ্জনকে দেখে নীরার বুঝতে বাকি রইল না, কী ঘটতে যাচ্ছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নীরা দেখেন নেতাজীকে লক্ষ করে জয়রঞ্জন গুলি ছুঁড়তে উদ্যত। কিন্তু গুলিটি লক্ষভ্রষ্ট হয়ে নেতাজীর বিশ্বস্ত সহচর ও দেহরক্ষী নিজামুদ্দিনকে বিদ্ধ করে। দ্বিতীয় গুলিটি নেতাজীর উদ্দেশে বেরনোর আগেই নীরার বায়নেট জয়রঞ্জনের জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেয়। মৃত্যুর আগে জয়রঞ্জন নিজের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে নীরাকে গুলিবিদ্ধ করে। গুরুতর আহত নীরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফেরার পরে নীরা দেখেন তাঁর মাথার কাছে বসে আছেন স্বয়ং নেতাজী। নেতাজীকে বাঁচানোর জন্য নীরা নিজের স্বামীকে যোগ্য শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথার সিঁদুর চিরদিনের জন্য নিজ হাতে মুছে দিয়েছিলেন। আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ বোধহয় একেই বলা যায়। নেতাজী নীরার নূতন নামকরণ করেন নীরা নাগিনী।

জাপানের পরাজয় দিয়ে শেষ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অক্ষশক্তির পতনের ফলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ। আজাদ হিন্দ বাহিনীর হাজার হাজার সেনা মিত্রশক্তির হাতে বন্দি হন। দিল্লির লালকেল্লায় তাঁদের বিচার হয়। বেশিরভাগ সেনা মুক্তিলাভ করলেও নীরা মুক্তি পাননি। শ্রীকান্তকে হত্যার অপরাধে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর শুরু হয় নীরার জীবনের অন্ধকারময় অধ্যায়। তাঁকে কলকাতার জেলে রাখা হয়। প্রথম দিন তাঁকে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি। ঘরের মেঝেতে বিনা শীতবস্ত্রে কাঁপতে কাঁপতে নীরা ঘুমিয়ে পড়েন। রাত প্রায় বারোটার সময় একজন প্রহরী এসে কোনও কথা না বলে দুটো কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায়। সকালে সূর্যোদয় হতেই ফুটন্ত গরম খিচুড়ি তাঁকে খেতে দেওয়া হয়। তারপরে ব্রিটিশ জেলার একজন কামারকে নিয়ে নীরার কুঠুরিতে প্রবেশ

করে। কামার হাতের বেড়ি কাটতে আরম্ভ করে। হাতের চামড়া উঠে আসে। নীরা বুঝতে পারেন তাঁকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আঘাত দেওয়া হচ্ছে। তবুও তিনি দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করে চলেন। পায়ের শিকল কাটতে গিয়ে কামার পায়ের হাড়ের ওপর হাতুড়ি মারে। নীরা যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলে ওঠেন, "তুমি কি অন্ধ যে পায়ের ওপরে মারছ?" কামার বলে ওঠে, "পায়ে কেবল নয়, দরকার পড়লে তোমার বুকের ওপরেও হাতুড়ি মারতে পারি, তুমি কিছু বলতে বা করতে পারবে না।" রাগে ফোঁসফোঁস করে বীরাঙ্গনা তার মুখে থুতু দিয়ে বললেন, "আমি জানি, আমি তোমাদের ক্রীতদাসী এবং তোমরা যা ইচ্ছা তা করতে পার। মেয়েদের সম্মান করতে শেখো।" জেলার কঠিন স্বরে নীরাকে বলল, "তোমায় মুক্তি দেওয়া হবে যদি তুমি বলে দাও নেতাজী সুভাষ বোস কোথায় আছেন।"

"সারা দুনিয়া জানে, তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।"

"তিনি বেঁচে আছেন। তুমি মিথ্যা বলছ, বলো তিনি কোথায় আছেন?"

"হ্যাঁ নেতাজী বেঁচে আছেন, আমার হৃদয়ে তিনি বেঁচে আছেন।"

ক্রোধে উন্মত্ত জেলার বলল, "তাহলে তোমার বুক থেকে সুভাষকে বের করে আনব।"

একথা বলে জেলার নীরার জামা ছিঁড়ে কামারকে ইশারা করল। কামার বাক্স থেকে বের করে আনল মহিলাদের ওপর অত্যাচার করার মধ্যযুগীয় যন্ত্র 'Breast Ripper', যা দেখতে অনেকাংশে সাঁড়াশির মতো। জেলার দুহাতে তাঁর গলা টিপে ধরে থাকে, আর কামার Breast Ripper দিয়ে ডান স্তনটিকে উপড়ে ফেলে। রক্তের স্রোত বয়ে যায়। নীরার আর্ত চিৎকারে জেলের আকাশ বাতাস কম্পিত হয়ে ওঠে। জ্ঞান হারানোর আগে নীরা শুনতে পেলেন জেলারের উন্মত্ত আস্ফালন, "মুখে মুখে তর্ক করলে অন্যটিও উপড়ে নেওয়া হবে।"

কলকাতায় আদালতে জে এন ঘোষ নীরার হয়ে সওয়ালের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে প্রায় কিছুই বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তিনি মামলাটি হেরে যান। এ ছিল বিচারের নামে প্রহসন। ব্রিটিশরা আগেই নীরার সাজা ঠিক করে রেখেছিল। তাঁকে পাঠানো হয় আন্দামানের সেলুলার জেলে, এক অন্ধকার কুঠুরিতে রাখা হয়। দিনের আলো সেখানে পৌঁছত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁকে হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হত। নীরা ছিলেন কট্টর নিরামিষাশী। এই বিষয়টিকেও ব্রিটিশরা অত্যাচারের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। তাঁকে জোর করে পচা মাংস খাওয়ানো হত। কখনও তাঁকে চরকির মতো একটি মেশিনে বসিয়ে এমনভাবে ঘোরানো হত, যাতে তাঁর হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। এইসবের পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল একটাই—নেতাজীর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। দিনের পর দিন অত্যাচার চলত, কিন্তু ব্রিটিশরা নীরার কাছ থেকে কোনও খবরই আদায় করতে পারল না।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর জেল থেকে বন্দিরা ছাড়া পান। কিন্তু ব্রিটিশরা আধমরা নীরাকে ফেলে দিয়ে যায় আন্দামানের এক নির্জন দ্বীপে, যাতে তিনি বন্য জন্তুদের আক্রমণে মারা যান। কিন্তু নীরাকে বাঁচালেন দ্বীপের অধিবাসীরা। তাঁরা নীরাকে সুস্থ করে তোলেন। কয়েক মাস পরে ধীরে ধীরে নীরা তাদের ভাষা বুঝতে ও বলতে পারেন। নীরা দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা

প্রকাশ করলে অত্যন্ত দুঃখিত মনে তারা তাঁকে দেশে পাঠানোর সমস্ত ব্যবস্থা করে। সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত নৌকা, দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি একটি কম্পাস ও একটি মানচিত্র, যথেষ্ট ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সহ দুটি অভিজ্ঞ নাবিককে দিয়ে তারা তাঁকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় জানায়। তারা প্রচুর মুক্তোও দিয়েছিল যাতে নীরা সেগুলি দেশের সেবার জন্য ব্যবহার করতে পারেন।

বেশ কিছুদিন যাত্রার পর ছোট নৌকাটি মাটি স্পর্শ করল, কিন্তু ভূখণ্ডটি ভারতবর্ষ ছিল না, ছিল ইন্দোনেশিয়া। উপকূলে পৌঁছবার পর নাবিক দুটি নীরাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে যায়। কয়েকটি মুক্তো বিক্রি করে নীরা কিছু অর্থ জোগাড় করেন ও দেশের জন্য নতুন করে পরিকল্পনা করতে থাকেন। স্বাধীনতার পরে তখনও প্রায় পাঁচশোটি স্বাধীন করদ রাজ্য ছিল, যাদের মধ্যে প্রধান ছিল হায়দ্রাবাদ। স্বাধীনতার আনন্দকে অনেকটাই প্রশমিত করে দিয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। নীরা ভারতে এসে প্রথম ওঠেন হায়দ্রাবাদে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারী নিজামের হাত থেকে হায়দ্রাবাদকে স্বাধীন করে ভারতের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। নীরা আবার হাতে বন্দুক তুলে নেন এবং হায়দ্রাবাদ লিবারেশন ওয়ার-এ যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে হায়দ্রাবাদ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর নীরা দেখলেন, স্বাধীন ভারতে তাঁর কোনও স্থান নেই। কোথায় থাকবেন, কী খাবেন, কিছুই জানেন না। হায়দ্রাবাদের ফুটপাথে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর বানালেন, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির কর্মীরা সেই কুঁড়েঘর ভেঙে দিল। নীরাকে জানানো হল, সরকারি স্থানে থাকা যাবে না। তিনি ফুল বিক্রি করতে শুরু করলেন। স্থানীয় লোকেরা তাঁকে পেডাম্মা বা বড়মা বলে ডাকত। পরে সরকার তাঁকে মুক্তিযোদ্ধার পেনশন দিতে চাইলে নীরা তা ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, "আমি দেশের জন্য লড়াই করেছি, ভিক্ষা নেওয়ার জন্য নয়।"

তাঁর শেষদিনগুলি কেটেছিল নিদারুণ কষ্টে। ১৯৯৮ সালের ২৬ জুলাই হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া হাসপাতালের এককোণে সম্পূর্ণ অবহেলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই অগ্নিকন্যা। বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তাঁর মৃতদেহের সৎকারের জন্য কাউকেই পাওয়া যায়নি। তেজপাল সিং ধামা নামে এক সাংবাদিক তাঁর শেষকৃত্য সম্পাদন করেছিলেন, দিয়েছিলেন একটি পুষ্পস্তবক আর দুফোঁটা অশ্রু।

নীরাকে তাঁর আত্মত্যাগের মর্যাদা আমরা দিতে পারিনি। ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, "স্বার্থশূন্য মানুষই বজ্রসদৃশ।" স্বার্থশূন্যতা কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, নীরা তাঁর জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন, দেশের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত প্রয়োজনকেও ছাড়তে হয়, কিন্তু কোনও কিছুর জন্য দেশকে ছাড়া যায় না। যাঁকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত, যাঁকে কর্তব্যের প্রতীক বললেও কম বলা হয়, আজ তাঁর অস্তিত্ব কোথায়?

সেই মহীয়সীর চরণপ্রান্তে আভূমি প্রণাম।

তথ্যসূত্র

১। *আমার জীবনসংগ্রাম,* নীরা আর্য নাগিনী

২। *আজাদ হিন্দ কি পহলি জাসুস,* মধু ধামা